ভালোবাসি পশুপাখি

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

পুনশ্চ

সূচিপত্র

বাচ্চা হাতির গল্প	৭
খুনি	১৩
ভৌ ভৌ	২৩
রুপোলি ইলিশ	৩১
যে কষ্ট বোঝাতে পারেনি রিনি	৩৬
ছোট্ট সে এক ট্যাংরা	৪২
রোহন ও এক শালিখের গল্প	৪৬
মাস্তুসোনা হারিয়ে গেল	৫২
প্যাঁচার জন্য চোখের জল	৫৬
মুন্না ও মুন্নির গল্প	৬১
লামিদি	৬৫
শামুকখোলের ঘরবাড়ি	৭৪
একটি চড়াইপাখির জন্য	৭৯
শাওনের সঙ্গী	৮৩
খাঁচার পাখি	৮৯

বাচ্চা হাতির গল্প

রাত পেরিয়ে তখনও ভোর হয়নি। সবে অন্ধকার ফিকে হতে শুরু করেছে। শিশিরভেজা গাছের ডালে ডালে পাখিদের জলসা বসেছে। রোজই বসে। ঘুম-চোখে ঘরের দরজা খুলে দাওয়া পেরিয়ে পুকুরঘাটের দিকে দু'পা যেতে না যেতেই থমকে দাঁড়ায় মহাদেব। বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই, কয়েক মুহূর্ত পর চিৎকার করে ওঠে, 'হাতি, হাতির বাচ্চা।'

পুকুরঘাটের দিকে না গিয়ে দাওয়া পেরিয়ে ফিরে আসে ঘরে। তারস্বরে ছেলেকে ডাকে। সাতসকালে কীসের এত হাঁকডাক—শুধু মানিক নয়, ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে ঘরের সকলে।

হাতি, হাতির বাচ্চা শুনে মানিক একলাফে চৌকি থেকে নেমে খড়চালের ছিটেবেড়ার বাইরে আসে। খুঁজতে থাকে কোথায় হাতি, হাতির বাচ্চা।

পায়ে পায়ে একটু এগিয়ে পুকুরপাড়, কুমড়োমাচা ছাড়িয়ে ভারি অবাক হয় মানিক—সোনাঝুরি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই হাতির হাচ্চা। দলমা পাহাড় থেকে কাঁকড়াঝোর-তামাজুড়ি-ভোলাবেদার পথ ধরে এই বেলপাহাড়িতে কখনো হাতির পাল এসেছে, দাপিয়ে কাঁপিয়ে ফসল নষ্ট করে চলে গেছে, এমন অবশ্য দু'চার বার ঘটেছে। গেল বছরই তো হাতি প্রচুর ফসল নষ্ট করেছে। পর পর দু'দিন হাতি এসেছিল। তিন দিনের দিন গ্রামের মানুষজন হাতে হাতে মশাল নিয়ে রাত জেগে পাহারা দিয়েছিল। না, সেদিন আর হাতি আসেনি। সারা রাত খেতের চারপাশে জেগে বসে থেকে মশার কামড় খাওয়াই সার হয়েছে।

মাঠভরা সবুজ ধান হাওয়ায় যখন দুলে ওঠে, তখন গ্রামের গরিব চাষিদের মনে আতঙ্কের মেঘ জমে, হাতি এসে আবার নষ্ট করে দেবে না তো!

দাপিয়ে কাঁপিয়ে এগিয়ে যাওয়া ধেড়ে হাতিদের পাল নয়, দলছুট এক বাচ্চা হাতি ধরাছোঁয়ার মধ্যে এভাবে সোনাঝুরিতলায় দাঁড়িয়ে আছে, সত্যিই তা ভাবা যায় না! এরকম কোনো ছবি মানিক কখনও কল্পনাও করেনি। অকল্পনীয় এই দৃশ্যে মানিক প্রথমে হতচকিত হয়ে গিয়েছিল। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে কয়েক মুহূর্ত লেগে যায়। দেখে, পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার বাবা। বাবার চোখেমুখে আনন্দ-বিস্ময়।

ততক্ষণে পূব আকাশ লাল হয়েছে। একটু আগেও শেষ রাতের আমেজ ছিল। সেই আবছা আলো, আলো-আঁধারি আর নেই। প্রথম সকালের আলোয় দূরের ধানভরা সবুজ মাঠ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আলো পড়েছে শাল-জঙ্গলে, মহুয়া-পিয়াল-শিরিষের শাখা পাতায়। এই আলোয় মানিক লক্ষ করে ছোট্ট হাতিটির চোখ ছলছল, কাঁদছে।

সোনাঝুরি গাছের আশপাশে আরও কয়েকজন এরই মাঝে এসে ভিড় করেছে। সকলেই অবাক, আনন্দ আর ধরে না। ছোটোরা হইহই করে ওঠে। বড়োরা যেমন হয়, সবকিছু নিয়েই কেমন যেন গম্ভীর-গম্ভীর আলোচনা করে, এখানেও তেমনই করতে থাকে তারা। কোথা থেকে হাতিটি এল, কী করেই বা তাকে ফেরত পাঠানো যাবে। ফেরত পাঠাতে না-পারলে দলছুট হাতি কী আর বাঁচবে।

বড়োদের আলোচনা মানিকের মোটেই ভালো লাগে না। এসব না-শুনে কলাগাছ কেটে নিয়ে এসে দেয় হাতিটিকে। শুঁকেও দেখে না সে। জড়ো হওয়া ছোটরা 'ও হাতি, ও হাতি' বলে ডাকাডাকি করে। হাতিটি কিছুই খায় না, কিছুই শোনে না। নট-নড়নচড়ন, স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

'আহা বেচারা, মা হারিয়ে মন-মরা হয়ে পড়েছে। এতটুকুন এক ছোট্ট হাতি—ওকে নিয়ে কী যে করি! মানিক আপন মনে বিড়বিড় করে এসব বলতে বলতে হাতিটির গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। হাতিটি শান্তশিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, চোখ পিটপিট করে। সারা গায়ে তার কাদা মাখা। দলমা পাহাড় থেকে বেলপাহাড়ি আসা তো চাট্টিখানি কথা নয়। বনজঙ্গল, এবড়োখেবড়ো পথ। এত ধকল কি এই দুধের শিশু সইতে পারে! হাঁটতে হাঁটতে হাঁপাতে হাঁপাতে কোথাও হয়তো জল-কাদায় হোঁচট খেয়ে পড়েছিল। এসব ভেবে মানিকের মনে সমবেদনা জাগে। 'আহা রে' বলে এক বালতি জল নিয়ে এসে হাতির গায়ে লেগে থাকা কাদামাটি সব ধুয়ে সাফ করে দেয়।

ডলে রগড়ে কাদামাটি সাফ হয়, হয়তো হাতিটির একটুআধটু ব্যথাও লাগে, কিন্তু মুখে টুঁ শব্দটিও করে না। সাফসুতরো করার পর মানিক নিজের হাতে দুয়ে আনে গোরুর দুধ। তা মুখের সামনে ধরামাত্র শুঁকে মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয় হাতি।

ভিড়ের মাঝে মাধব দাঁড়িয়েছিল। মাধব ও মানিক একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়ে। যদিও তার সমবয়েসি নয়, মাধব বেশ বড়ো। এক ক্লাসে দু'বার থেকে একটু মজবুত হয়ে তবেই সে নতুন ক্লাসে ওঠে। ফলে সিক্সে উঠতে না-উঠতেই গোঁফ-দাড়ি গজিয়ে গেছে। পাহাড়টুলির পথে ইট পেতে প্রফুল্ল পরামাণিক যে সেলুন খুলেছে, সেই সেলুনে সে প্রায়ই যায়। ভিড়ের ভেতর থেকে সেই মাধব পরামর্শ দেয়, 'কাঁচা দুধ খাবে না, একটু গরম করে দে, যদি খায়।'

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে দুধ ফুটিয়ে আনে মানিক। না, গরম করা দুধও হাতি খেল না। শুঁকে আবার মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

মুখে মুখে খবর ছড়িয়ে পড়ায় হাতির বাচ্চাটিকে দেখার জন্য বেজায়রকম ভিড় জমে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে সেই ভিড় পাতলা হতে থাকে। আর কতক্ষণই বা দাঁড়িয়ে থাকা যায়! সাতসকালেই রোদের কী তাপ! দরদরিয়ে ঘামছে সবাই। চোত পেরিয়ে বোশেখ। তেমন বিষ্টি-বাদলা নেই। দূরে পাহাড়ের গায়ে কুচকুচে কালো মেঘ আর আগের মতো জমাট বাঁধে না। ধুলো উড়িয়ে ঝড় ওঠে না।

রোদে ঠায় দাঁড়িয়ে ঘেমে নেয়ে শেষে যে যার বাড়িতে ফিরে যায়। সোনাঝুরিতলা ফাঁকা শুনশান হয়ে যাওয়ার পর মানিক বাচ্চা হাতিটিকে অনেক অনেক আদর করে। সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। ঘাড়ে, কানের আশেপাশে সুড়সুড়ি দেয়। কী ভালোই না লাগে! বয়েস যতই অল্প হোক না কেন, আদর সে খুব বোঝে। তাই আরও কাছে এসে একেবারে মানিকের গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়ায়। খুব আস্তে মাথা দোলাতে থাকে।

মানিক ভাবতেও পারেনি একটু আদর, একটু ভালোবাসার স্পর্শ পেয়ে হাতিটির মন ভরে উঠবে, এইভাবে আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করবে! হাতির দুঃখ-কাতরতায় একটু ভালোবাসার প্রলেপ বুলিয়ে দিতে পেরেছে, একথা ভেবে মানিকের বড়ো ভালো লাগে। গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে হাতিটিকে সোনাঝুরি

গাছ, লালমাটির পথ, আকাশমণির ছায়া পেরিয়ে নিয়ে আসে বাড়ির লাগোয়া বাগানে। দুলকি চালে পায়ে পায়ে বাগানে পৌঁছে পুঁচকে হাতি জবাগাছের একটি ডাল ভেঙে চিবোতে শুরু করে। মানিক বুঝতে পারে, খুব খিদে পেয়েছে তার। যতই দুঃখ পাক, কষ্ট হোক, কতক্ষণই বা আর না-খেয়ে থাকা যায়। খিদের জ্বালা বড়ো জ্বালা। নিজের মনে এসব বলতে বলতে মানিক ছুটে যায় সোনাঝুরি গাছের তলায়। হাতির না-খাওয়া কলাগাছটি তো ওখানেই পড়ে রয়েছে।

রোদে কেমন মলিন-বিবর্ণ হয়ে পড়েছে কলাগাছ। হাতির বাচ্চাটি আগে তরতাজা কলাগাছ না-খেলেও এখন এটিই পরম তৃপ্তিতে খায়। মানিকের মা দাওয়ায় বসে সব দেখছিল। হাতির জন্য তখুনি একটু গরম দুধ নিয়ে আসে। খুব গরম দুধ। মুখে দিলেই জিভ পুড়ে যাবে। মা তালপাতার পাখা দিয়ে গরম দুধ জুড়িয়ে দেয়। আগের বার না-খেলেও এবার চুকচুক করে সেই দুধ খেয়ে নেয়।

হাতির বাচ্চাটিকে খেতে দেখে মানিকের মনে জমে থাকা দুশ্চিন্তা কর্পূর হয়ে উবে যায়। এই কাঠফাটা রোদে, জবজবে ঘামেও যেন ফুরফুরে বাতাস বইতে থাকে। বাবা দূরে দাঁড়িয়ে এসব দেখছিল। হাতিটি খাচ্ছে দেখে বাবাও যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। দু'কলি পল্লিগীতি গাইতে গাইতে খেতের পথে পা বাড়ায়।

বাবা চাষের কাজে খেতে গেলেও মানিক স্কুলে গেল না। সারাক্ষণ হাতিটির কাছে কাছেই রইল। দুপুরের দিকে নিজে খেল, হাতিটিকেও খাওয়াল। দুধ-ভাত বেশ আয়েস করেই খেল হাতি। শুধু খেলই না, বাতাবিগাছের ছায়ায় শুয়ে একটু ভাতঘুমও দিল। দুপুরেও এ-গ্রাম সে-গ্রাম থেকে দু'চারজন হাতির বাচ্চাটিকে দেখতে এল। দু'চার মিনিট দাঁড়িয়ে হাতি ঘুমোচ্ছে দেখে শেষে চলেও গেল।

উটকো লোকেরা, মজা দেখতে আসা মানুষজন চলে গেলেও মানিক সারা দুপুর ঠায় দাওয়ায় বসে থাকে। মা বলে, 'দিনভর কি হাতি-হাতি করে কাটাবি। একটু পড়তে বোস।' এই বলে মা অঙ্কের বই-খাতা দিয়ে যায়।

মানিক গ.সা.গু করে, কিছুতেই মেলাতে পারে না। গ.সা.গু ছেড়ে ল.সা.গু। ল.সা.গুও মেলে না। শেষে বই-খাতা দূরে সরিয়ে রেখে ছুটে যায় বসে থাকা হাতিটির দিকে।

হাতির সঙ্গে মানিক কত কথা বলে। গল্পে পড়া রাজারাজড়া যেমন হাতির পিঠে চেপে ঘুরে বেড়ায়, যুদ্ধে শিকারে যায়, তেমন সেও যাবে। শিলদা, বিনপুর, দহিজুড়ি পেরিয়ে পৌঁছে যাবে শহর ঝাড়গ্রামে। জঙ্গলের মাঝে ডুলুং নদী, পাশেই কনকদুর্গার মন্দির, রোগা নদী পেরিয়ে চিলকিগড় রাজবাড়ি। ওদিকে কখনও যায়নি মানিক। স্কুলের মহিমস্যারের মুখে গল্প শুনেছে। ঝাড়গ্রামে শুধু নয়, ভোলাবেদা-শিয়রবেদা পেরিয়ে হয়তো কোনোদিন চলে যাবে কাঁকড়াঝোরের জঙ্গলে। বাঘ-সিংহ না থাকুক, ভালুক-টালুক আছে শুনেছে। হাতির পিঠে বসে ছমছমে জঙ্গলের পথে ঘুরতে ঘুরতে যদি একটু ভালুকেরও দেখা মেলে, সে তো কম নয়। ভালুকের কথা ভাবা মাত্র নীচু ক্লাসে পড়া ঈশপের গল্প মানিকের মনে পড়ে যায়।

এইসব ভাবতে ভাবতে, হাতির বাচ্চাকে আদর করতে করতে দুপুর-বিকেল ফুরিয়ে আসে, সন্ধে নামে। বাবাও খেতের কাজ শেষ করে ফিরে আসে। সামনের পুকুর থেকে একঝাঁক হাঁস লাল মাটির পথ ধরে চলে যায়। মাঠে ঘাস খেতে যাওয়া গোরুরাও ওই পথ ধরে ঘরে ফেরে। রকমারি ডাক ডাকতে ডাকতে উড়ে যায় ঘরমুখো কত পাখি।

প্রতিদিনের এ চেনা ছবি। অন্যদিন এই সময় মানিক পড়তে বসে পড়ে। আজ পড়তে না বসে হাতি কোথায় থাকবে, কী খাবে—এসব ভাবতে থাকে। বাবা স্নান সেরে মুড়ি-লঙ্কা চিবোতে চিবোতে মানিকের ভাবনার রসদ জোগায়। বাবার কথামতো খড়-বিচালি দিয়ে মানিক হাতির বাচ্চার জন্য বিছানা করে ফেলে। ঠিক হয় রাতেও সে দুধ-ভাতই খাবে।

লণ্ঠনের আলোয় বাবা হঠাৎই লক্ষ করে, হাতির বাচ্চাটি কাঁদছে। চোখ জলে ছলছল করছে। মানিক ঘরের ভেতরে গিয়েছিল। বাবার ডাকে তখুনি ফিরে আসে। হাতির চোখে জল দেখে কেমন কাঁদো কাঁদো গলায় বাবাকে জিজ্ঞেস করে, 'হাতিটা আবার কাঁদছে যে! কী হল মন খারাপ?'

বাবা মানিকের কথায় সায় দেয়, 'মন খারাপ তো হবেই! বাবা মা সবাইকে ছেড়ে একা এখানে পড়ে রয়েছে। এতটুকুন এক বাচ্চা, ও কি একা থাকতে পারে!'

মা রান্নাঘরে রাতের রান্না করছিল। হঠাৎ মানিকের ডাক শুনে দাওয়ায় ছুটে আসে। মাকে প্রায় জোর করেই সে নিয়ে যায় হাতির কাছে। মা'র আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেয় হাতির চোখের জল। বাচ্চা হাতিটি কাঁদছে দেখে মা'র বুঝি কষ্ট হয়। হাত বুলিয়ে দেয় তার গায়ে।

রাতে দুধ-ভাত খেতে দেয় মানিক। কত আদর করে। না, কিছুতেই খেল না হাতির বাচ্চা। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। অনেক বোঝানোর পর শেষে খড়-বিচালির বিছানায় বসে।

হাতির বাচ্চা কিছুই খেল না দেখে মানিকের মন খারাপ হয়ে যায়। রাতে তারও খেতে ইচ্ছে করে না। মাখা ভাত ফেলে উঠে পড়ে। 'কী হল রে', মা জানতে চাওয়ায় কথা না বাড়িয়ে শুধু বলে, 'গা গুলিয়ে উঠল।'

হাতিটির খড়-বিচালির বিছানার লাগোয়া সামনের ঘরে বাবার সঙ্গে মানিক শোয়। অন্যদিন শোওয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়ে। আজ আর ঘুম আসে না। ক্লান্ত বাবা ঘুমিয়ে পড়েছে কখন। মানিকের চোখে ঘুম নেই। বারবার বিছানা ছেড়ে উঠে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে দেখে হাতিটি কী করছে!

চারপাশে থইথই করছে জোছনা-আলো। এই আলোতেও হাতির চোখের পাতা বোজা, না-খোলা, ঘুমোচ্ছে কি না, দূর থেকে কিছুই দেখা যায়না। ঝিঁঝি ডাকে, জোনাক ওড়ে। রাত-জাগা দুধ-সাদা লক্ষ্মীপেঁচা ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে যায়, জানলার ধারে দাঁড়িয়ে মানিক এসব লক্ষ করে।

এইভাবে একটানা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর মানিকের ঘুম-ঘুম পায়। বিছানায় বাবার পাশে শুয়ে পড়ে।

হঠাৎই মাঝরাতে খ্যাপা হাতির ভয়ংকর চিৎকারে দু'জনেরই ঘুম ভেঙে যায়। মানিক ভয় পাওয়া মুখে বাবার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে, বাবাও ভীষণ ভয় পেয়েছে। জানলা দিয়ে বাইরে না-তাকিয়েও বুঝে ফেলে, গ্রামে হাতির পাল ঢুকেছে। এ-গাছ সে-গাছ ভাঙছে, গলা ফাটিয়ে বিচ্ছিরি শব্দ করছে। মানিক ও তার বাবা কাঁপা-কাঁপা পায়ে কোনোরকমে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। বিছানায় বসে বা জানলার দিকে যেতে যেতে বারবারই তাদের মনে হয় হাতির পাল যদি বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ে, তবে কী হবে! দুমড়ে মুচড়ে সব শেষ করে দেবে।

জানলার ধারে দাঁড়িয়ে অবশ্য দু'জনেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। অভাবনীয় এক দৃশ্য—এমনটি তারা কখনও কল্পনাও করেনি।

ততক্ষণে হাতির পালের সেই গলা ফাটানো বিচ্ছিরি ডাক থেমে গেছে। হাতির বাচ্চাটি খড়বিচালির বিছানা ছেড়ে বাগান পেরিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে লালমাটির পথে। দশ-বারোটি হাতি ঘিরে রয়েছে তাকে। মা হাতিটি তার গায়ে শুঁড় বুলিয়ে আদর করেই চলেছে।

জোছনা-আলোয় সব স্পষ্ট দেখা যায়। খানিকক্ষণ এভাবে আদর করার পর বাচ্চাটিকে আগলে নিয়ে পায়ে পায়ে হাতির পাল লাল মাটির পথ পেরিয়ে ভোলাবেদা-কাঁকড়াঝোরের পথ ধরে। চাঁদের আলোয় গাছপালা, লাল মাটির পথ, দূরের পিচরাস্তা সবই দেখা যায়। পায়ে পায়ে হাতিদের এগিয়ে যাওয়া দেখতে দেখতে মানিক চোখ মোছে। হাতির বাচ্চাটির জন্য তার মন কেমন করে। বাবা তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে তার মাথায় হাত রাখে। মানিকের মনে হয়, আর কেউ বুঝুক-না-বুঝুক, অন্তত বাবা তার কষ্ট বুঝতে পেরেছে। বাবা তাকে বোঝাতে থাকে—মাকে ফিরে পেয়ে বাচ্চা হাতিটি কী খুশিই না হয়েছে! মাকে না পেলে হয়তো বাঁচতই না সে।

বাবা তো ঠিকই বলেছে। মা'র মতো আর কে ভালোবাসতে পারে—মানিক নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে। তার কষ্ট ফিকে হয়ে আসে।

খুনি

শীত যাই-যাই করেও এখনও যায়নি। আজ ঠা-ঠা রোদ্দুর গরম-গরম ভাব তো কাল বেশ জাঁকালো শীত। হু-হু দখিনা বাতাসে কাঁপন ধরে শরীরে। দুপুরের ভাতটাত খাওয়ার পর মনে হয় তক্তপোশে কাঁথা জড়িয়ে একটু গড়িয়ে নিতে। সন্ধের দিকে বা খুব সকালে অশথতলার চায়ের দোকানে যারা জড়ো হয়, চা খায়, কেউ কেউ তারা আগুন জ্বেলে পারলে গোটা দেহটাকেই সেঁকে নেয়। আগুনের পাশে বসলে আরাম বোধ হয়। আরও ক'টা দিন এই দখিনা বাতাস চলুক, শীত থাকুক, এমনই বলাবলি করে চা-দোকানে জড়ো হওয়া মানুষজন।

সবুজ মাঠ রং বদলে হলুদ হয়ে বেশ দেখাচ্ছিল, এই তো ক'দিন আগেও। এলোমেলো বাতাসে ধানখেতে অবিরাম চলেছে দোলদুলুনি। দূর থেকে এই দোলদুলুনি দেখতে ভারি সুন্দর লাগে। মাটি-বাড়ির দোতলার জানলা দিয়ে অদ্ভুত এক ভালো লাগায় সে দিকেই কতদিন তাকিয়ে থেকেছে সুবল। শুধু দিনে নয়, রাতেও দারুণ লাগে। যখন জোছনা-আলো ছড়িয়ে পড়ে সবুজ-মাঠে, আহা, সে দৃশ্যের কী কোনো তুলনা হয়। জোছনা-আলোয় ন্যালাখ্যাপা পোশাকের কাকতাড়ুয়াকেও দেখা যায় স্পষ্ট। সবুজ ধানখেতে কত পাখি আসে, ভিড় করে, ধানে পাক ধরলে আসা-যাওয়া আরও বেড়ে যায়। ধানখেতে সন্ধের দিকে ভিড় করে সাদা-কালো ছাপছোপ কত না দোয়েল, সকালের দিকে শালিখই সংখ্যাগরিষ্ঠ। উড়ুৎ-ফুড়ুৎ ছোট্ট টুনটুনিও কতবার দেখেছে সুবল। ধান-কাটা শেষ হলে ধানের গোড়ায় জন্মানো খুদে পোকাদের খুঁজে খুঁজে খুঁটে খুঁটে খায় জড়ো হওয়া ছোট্ট পুঁচকে কত না পাখি! খায় পড়ে থাকা শস্যকণাও। চড়াইয়ের মতো আকার, দৈর্ঘ্যে ইঞ্চিখানেক বড়ো। দেখতেও চড়াইয়ের মতো। পাশের বাড়ির গণেশকাকার মুখে শুনেছে, এগুলো বগেরি পাখি। বগেরি ভিন্নদেশি পাখি। হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে রাশিয়া-আফ্রিকা, আরও কত দূর দেশ থেকে আসে। আসে ঝাঁকে ঝাঁকে। সেপ্টেম্বরের শেষে আসার শুরু। থাকে মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত। পরিযায়ী পাখি ওরা। চড়াইয়ের মতো গেরস্থ বাড়ির কড়িবরগায় নয়, মাঠেই তাদের দিন কাটে, এমনকি রাতেও ঘুরে বেড়ায়। ভুলেও কখনও ঝোপঝাড়ে গাছে বসে না। মাঠই তাদের ঘরবাড়ি। মাটির রঙের সঙ্গে গায়ের রঙের যথেষ্ট মিল আছে।

সুবল জানলা দিয়ে দেখতে পায় একঝাঁক বগেরি পাখি ছড়িয়েছিটিয়ে কাছে দূরে পোকা খুঁজছে, ধান-কাটা মাঠে পড়ে থাকা ধান খুঁজছে। বাড়ির সামনে মোরাম রাস্তা। লাল মাটির মোরাম রাস্তা পেরোলেই চাষ-জমি। সবে ধান-কাটা হয়েছে, ফলে সবুজের জৌলুস নেই। কেমন ন্যাড়া-ন্যাড়া দেখাচ্ছে। অনেক অনেক দূর পর্যন্ত এ মাঠ ছড়ানো। এই মেঘ-কুয়াশায় অবিশ্যি মনে হয় কাছেই মাঠের শেষ। আকাশ নেমে এসেছে মাঠে, দাঁড়িয়েছে পাঁচিল তুলে।

সুবল এক মনে উদাস হয়ে বসে এ-সবই দেখতে দেখতে ভাবতে থাকে গতকালের কথা। ভাবতে গিয়ে গা গুলিয়ে ওঠে। বিড়বিড়িয়ে বলে ফেলে, বীভৎস।